৭.৬ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ভিত্তিস্বরূপ জোটনিরপেক্ষতা
Non-alignment as the keynote of India's Foreign Policy

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হল জোটনিরপেক্ষতা ("Non-alignment is the keynote of India's foreign policy.") । জোটনিরপেক্ষতার অর্থ হল বিশ্বের কোনো শক্তিজোটের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, জোটনিরপেক্ষ মানে এই নয় যে, ভারতবর্ষ কোনো দেশের সঙ্গে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে তাকে সবসময় নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। **জোটনিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ** (passive neutrality) এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে **নেহেরু** বলেন, "যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন এবং ন্যায়নীতি আক্রান্ত, সেখানে আমরা কখনই নিরপেক্ষ থাকতে পারি না" (Where freedom is endangered and justice threatened, we cannot and shall not be neutral.) ইতিবাচকভাবে বললে, জোটনিরপেক্ষতা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার নীতি অনুসরণ।

বস্তুত জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করলেও ভারত আন্তর্জাতিক বিরোধ অথবা সমস্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখেনি। কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কঙ্গো সংকট, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত সরব হয়েছে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী নীতি ও ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে ভারত জাতিপুঞ্জসহ যে-কোনো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বা সম্মেলনে বা শীর্ষবৈঠকে অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে। বস্তুত বিশ্বের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় ও সমস্যা ছিল না যেখানে ভারত বলিষ্ঠভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি।

Scanned with CamScanner

জোটনিরপেক্ষতা নীতি সমদূরত্বের নীতি নয়। সহজভাবে বললে, ভারত জোটনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে বলে তাকে পুঁজিবাদী জোট ও সমাজতান্ত্রিক জোট থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বস্তুতপক্ষে ভারত জোটভুক্ত দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারগণ সঠিকভাবেই উপলব্ধিধ করেছিলেন যে, বর্তমান বিশ্বে ভারতের পক্ষে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের কারণ ঃ

ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কারণে। **মাইকেল ব্রেচার** (Michael Brecher) তাঁর *'Foreign Policy of India'* শীর্ষক প্রবন্ধে ওইসব কারণকে মূলত দু-ভাগে ভাগ করেছেন— **(১) বস্তুগত** এবং **(২) অবস্তুগত।** বস্তুগত কারণের মধ্যে রয়েছে **ভৌগোলিক** অবস্থান, অর্থনৈতিক উন্নতি। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারতের একদিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ পাকিস্তান এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট চিন। নেহেরু বলেছিলেন, এই অবস্থায় কোনো একটি জোটে যোগদান করার অর্থই হবে অন্য জোটের বিরাগভাজন হওয়া এবং যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা। তাই কোনো জোটে যোগ না দিয়ে জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করাই ছিল ভারতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুত ভারত যদি জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ না করত, তাহলে এটি বৃহৎ শক্তিবর্গের রণক্ষেত্রে পরিণত হত। **অর্থনৈতিক দিক থেকে** জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার যুক্তি ছিল এই যে, সদ্য স্বাধীন ভারতের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের, যা ভারতকে প্রধানত বিদেশ থেকে ঋণ বা সাহায্য নিয়ে জোগাড় করতে হবে। এই অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন যে, ভারত যদি কোনো একটি জোটে যোগ দেয়, তাহলে অন্য জোটের কাছ থেকে কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য পাবে না। তাই জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করাই শ্রেয়, যাতে বিশ্বের সকল দেশের কাছ থেকেই ঋণ বা সাহায্য পাওয়া যায় এবং দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারিত করা যায়।

অবস্তুগত কারণের মধ্যে পড়ে ইতিহাস, দর্শন, ঐতিহ্য ইত্যাদি। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য হল শান্তি, অহিংসা এবং পরমত সহিষ্ণুতা। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারগণ ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, কোনো শক্তিজোটের মধ্যে ঢোকা মানেই অশান্তি ডেকে আনা। তাই জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করলে শান্তি থাকবে এবং পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ উভয় মতাদর্শের ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করা যাবে।

অন্যান্য কারণ ঃ ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ— এ'দুটির কোনোটিই এককভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাঁরা পুঁজিবাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদের মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন স্বাধীনতা ও মানবিকতার সংকোচন। তাই তাঁরা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করলে ভারত তার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা সংরক্ষণে সমর্থ হবে এবং একই সঙ্গে নিজেদের জাতীয় ভাবধারা ও জাতীয়তাবোধকে সম্প্রসারিত করতে পারবে। **সবশেষে** উল্লেখ করতে হয়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপকারদের ওপর রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিশেষ করে গান্ধিজির প্রভাবের বিষয়টি। গান্ধির অহিংস নীতি ও সর্বোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষদের পক্ষে শক্তি-রাজনীতির অংশীদার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

সমালোচনা ঃ জোটনিরপেক্ষতা ভারতের বৈদেশিকনীতির প্রধান স্তম্ভ হলেও, সমালোচকদের মতে ভারত এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম বিচ্যুতি ঘটে ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। ওই সময় ভারত একদিকে কোরিয়াতে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছে, অন্যদিকে জাতিপুঞ্জের সেনাবাহিনী ৩৩° অক্ষাংশ অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলে ভারত তার বিরোধিতা করেছে।। এজন্য ভারতকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে ভারতের দ্বিতীয়বার বিচ্যুতি ঘটে ১৯৫৬ সালে। ওই সময় সুয়েজ সমস্যাকে

Scanned with CamScanner

কেন্দ্র করে ভারত ইজিপ্টের ওপর ব্রিটিশ ও ফরাসি আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করলেও, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কথাও খরচ করেনি।

১৯৬৮ সালে পুনরায় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষপাতমূলক আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হলে ভারত ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে, কিন্তু ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত নীরব থাকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি পুনরায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ওই যুদ্ধে মার্কিন আক্রমণের আশঙ্কায় এবং নিজের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সমালোচকদের মতে, ওই চুক্তি ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও ভারত নীরব থাকে। অথচ আফগানিস্তান একটি জোটনিরপেক্ষ দেশ।

বাস্তবিকপক্ষে ৮০-র দশক পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একদিকে ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে, আবার অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য কারণে ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে।

তবে গত শতকের ৮০-র দশকের শেষ থেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ওই সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির রমরমা অবস্থা, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, বিশ্ব রাজনীতিতে একদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য হ্রাস অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য—এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। ওই সময় থেকে ভারত-মার্কিন সমঝোতা নতুন গতি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পথিকৃৎ ভারতবর্ষ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে নিয়ে জাতিপুঞ্জ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তা না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর মার্কিন সামরিক বিমানকে ভারত থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের মানবতা বিরোধী আচরণ ও জাতিপুঞ্জের মার্কিন তোষণনীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। গ্যাট চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতি ইস্যুতে ভারত নির্জোট আন্দোলনের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে এই পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যে। যে নির্জোট আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত সাম্প্রতিক অতীতে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেই নির্জোট আন্দোলনের প্রাণভোমরা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে নির্জোট আন্দোলন ও তার মুখপাত্র ভারত দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতকেও ক্রমশ বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্যের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

Scanned with CamScanner